এই পুস্তিকার পরিকল্পনা, প্রকাশনা এবং মুদ্রনঃ

শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান

কেন্দ্রীয় সচিবালয়

প্রযত্নেঃ সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস

৬৬/২, শরৎ চন্দ্র ধর রোড, কলকাতা — ৭০০০৯০

টেলিফোন - ৯৮৮৩০২২৮৯৬, ৯৩৩১৯৯২৮৯৭

ইমেল - caclcs@yahoo.com

সহায়তাঃ

ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস

চান্দেরলোক বিল্ডিং, পঞ্চম তল,

৩৬, জনপথ, নিউ দিল্লী—১১০০০১

ইমেল—rtedivisionncpcr@gmail.com

জেনে নিন

শিশুদের জন্য
বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক
শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান

শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান শিশুদের অধিকার দাবী করার একটি জাতীয় নাগরিক মঞ্চ। দেশের ১৮টি রাজ্যে এই অভিযান কাজ করে। শিশুশ্রম বিরোধী অভিযানের সদস্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ নাগরিক। শিশুশ্রম বিরোধী অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য এই দেশ থেকে শিশুশ্রম প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। এই অভিযান মনে করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই শিশু, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা প্রতিটি শিশুই সম্ভাব্য শিশুশ্রমিক। শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য প্রথম প্রয়োজন কমন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে বিনামূল্যে উন্নত শিক্ষাকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে দু-চার কথা

১৯৫০ সালে সংবিধান তৈরীর মুহূর্তেই আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ ১৪ বছরের কম বয়সি ভারতের সমস্ত শিশুর জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৮ সালে কোঠারী কমিশন ভারতের সমস্ত শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য “কমন স্কুল সিস্টেম”-এর সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে সুপ্রীম কোর্ট একটি রায়ে বুনিয়াদি শিক্ষা ১৪ বছরের কম বয়সি সমস্ত শিশুর জন্য মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষনা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর ৬২ বছর ধরে শিশুদের শিক্ষায় মৌলিক অধিকার আইনি স্বীকৃতি পায়নি।

গত ২০০২ সালে ভারত সরকার সর্বপ্রথম ৬-১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয় আর ২০০৯ সালে ঐ অধিকার বাস্তবায়িত করার জন্য “শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন” তৈরী করে।

যদিও নানা অসম্পূর্ণতা এবং কিছু বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কারণে নাগরিক সমাজের একাংশের মধ্যে এই আইনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় আছে কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সমস্ত (০-১৮ বছর পর্যন্ত) শিশুদের জন্য সমান এবং উন্নত গুনমান সম্পন্ন শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার করার দাবী পুরনে এই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই আপামর জনসাধারণকে এই আইন জানতে হবে এবং এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য নিজের নিজের জায়গায় সচেষ্ট হতে হবে।

তাই এই আইনের একটি সরল অথচ সম্পূর্ণরূপ জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য “শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান” এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করছে।

ধন্যবাদান্তে—
প্রবীর বসু
জাতীয় আহ্বায়ক
শিশুশ্রম বিরোধী অভিযান

শিশুদের জন্য
বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক
শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

এই আইনটি ১লা এপ্রিল ২০১০ থেকে
জম্মু এবং কাশ্মীর ছাড়া
ভারতের সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে
চালু হয়েছে।

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009

(Simplified version in Bengali)

শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুদের কি কি অধিকার আছে?

৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যালয়-শিক্ষা (বুনিয়াদি শিক্ষা) পাবার অধিকারি। কোনো শিশুর কাছ থেকে এমন কোনো অর্থ কেউ নিতে পারবেন না বা দাবী করতে পারবেন না যে অর্থ না দিতে পারলে ঐ শিশুর বুনিয়াদি-শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।

শারীরিক এবং মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধি শিশুরাও যেকোনো বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিশুদের মতো সমানভাবে বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পাবে। তাদের শিক্ষার জন্য পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট ১৯৯৬-এর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

৬ বছরের বেশী বয়সি কোনো শিশু, যে কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা কিছুদিন পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে, তাকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতেই ভর্তি করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ শিশুটিকে তার বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুরা, যারা উপরের নিয়মে বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, তারা যদি তাদের বয়স ১৪ পূর্ণ হওয়ার আগেই বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে না পারে, তবে তাদের বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পাওয়ার অধিকারি থাকবে।

শিক্ষার অধিকার আইনে শিশুদের কি কি অধিকার আছে?

যে কোনো শিশু, যে কোনো বিদ্যালয়ে (যেখানে সে এই আইন অনুযায়ী বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পেতে পারবে)ভর্তি হবার জন্য তার বর্তমান বিদ্যালয়ের কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer Certificate) চাইতে পারে। বিদ্যালয় তাকে সেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য।

কোনো ব্যক্তি বা কোনো বিদ্যালয় কোনো শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ক্যাপিটেশন ফি (বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনুদান) নিতে পারবে না। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বয়স ঠিক করা হবে মূলতঃ তার জন্ম সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে। কিন্তু জন্ম সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো বয়সের প্রমানপত্র নেই বলে কোনো বিদ্যালয় কোনো শিশুকে ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিশুকে কোনো শ্রেণীতে এক বছরের বেশী রাখা যাবে না এবং কোনো কারনেই বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।

কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিশুকেই শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তার উপর মানসিক অত্যাচার করা যাবে না।

শিশুরা কোন বিদ্যালয়ে, কিভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা পাবে?

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং সৈনিক বিদ্যালয় ছাড়া সরকার দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশুরা বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পাবে।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি তাদের প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যের পরিমানের অনুপাতে তাদের মোট ছাত্রসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশকে বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমান যাই হোক না কেন ঐ সমস্ত বিদ্যালয় তাদের মোট ছাত্রসংখ্যার কমকরে ২৫ শতাংশকে বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২১/২/২০১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী পিছু সর্বাধিক ২৪০ টাকা করে ‘ডেভেলপমেন্ট ফি’ নিতে পারবে এবং এছাড়া অন্য কোনোরকম ‘ফি’ নিতে পারবে না। যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবক ঐ ‘ডেভেলপমেন্ট ফি’-ও দিতে অসমর্থ হন তবে তিনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করতে পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারী অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা সমন্ধে খোজখবর নিয়ে আবেদনকারীকে ‘ডেভেলপমেণ্ট ফি’ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মনোমত না হলে আবেদনকারী অভিভাবক ‘ডেভেলপমেন্ট ফি’ মুকুবের জন্য ১৫ দিনের মধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পুনরায় আবেদন করতে পারেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ঐ আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ঐ আবেদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

বেসরকারী বিদ্যালয় (যারা কোনো রকম সরকারী সাহায্য পায়না) প্রতি বছর প্রতি শ্রেণীতে মোট যে পরিমান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করবে, কমপক্ষে তার ২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের দুর্বলতর বা পিছিয়ে পরা শ্রেণি থেকে নেবে এবং ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে। ঐ ২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই আসবে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী (Neighbourhood) এলাকা থেকে।

একটি সরকারী বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য যে পরিমান অর্থ খরচ হয় সরকার সেই পরিমান অর্থ দুর্বলতর এবং পিছিয়ে পরা শ্রেণী থেকে আসা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য (যারা ঐ বেসরকারী বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পাচ্ছে) সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিদ্যালয়কে প্রতি বছর দেবে।

প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কি কি করতে বাধ্য?

এই আইন চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রত্যেকটি জনবসতির এক কিমি-র মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় (যদি না থাকে)এবং তিন কিমি-র মধ্যে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় (যদি না থাকে) স্থাপন করবে। (কেন্দ্রীয় মডেল রুল অনুযায়ী)

এই আইন চালু হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় সরকার (পঞ্চায়েত/ পৌরসভা) সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ এবং সমস্ত উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩৫:১ করবে। অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যালয়ে ৩০/৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।

রাজ্য সরকার কি কি করবে?

রাজ্য সরকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবে।

৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

রাজ্য সরকার প্রতিটি এলাকায় (neighbourhood) আইন-নির্দিষ্ট দুরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবে।

৯/১২/২০১১ তারিখে লিখিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই আইন এবং রাজ্য সরকারের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রতিটি শিশুকে তার বাসস্থানের নিকটবর্তী কোন বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। কোলকাতা বা প্রাকৃতিক কারণে দূর্গম এলাকার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব ১/২ কিমি এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব ১ কিমির বেশী হবেনা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বা এলাকার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব যথাক্রমে ১ কিমি ও ২ কিমির বেশী হবে না।

রাজ্য সরকার শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

দুর্বলতর শ্রেণী এবং পিছিয়ে পরা শ্রেণী থেকে আসা শিশুরা যাতে তাদের বিদ্যালয়ে কোনোভাবেই বৈষম্য, আলাদা ব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের শিকার না হয় সেটা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) কি কি করবে?

স্থানীয় সরকার তার এলাকার ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং প্রতিটি শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করবে।

৬ বছরের বেশী বয়সি শিশুদের তাদের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত করে তোলার জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা এই আইনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিটি এলাকায় (neighbourhood) আইন-নির্দিষ্ট দুরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে এবং এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়াশুনার জিনিসের ব্যবস্থা করবে।

স্থানীয় সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

স্থানীয় সরকার তার অঞ্চলের ৬-১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর তথ্য নিয়মিত ভাবে রাখার ব্যবস্থা করবে।

স্থানীয় সরকার তার এলাকায় অন্য জায়গা থেকে কাজের খোঁজে আসা পরিবারগুলির (Migrant Families) প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবে।

স্থানীয় সরকার তার এলাকায় চলা প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের নিয়মিত তদারকি করবে।

এই আইন অনুযায়ী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কে দেবে?

এই আইন প্রয়োগের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় সরকার একটা হিসাব করে ঠিক করবে যে এই আইনের ব্যবস্থাগুলি বাস্তবে প্রয়োগের জন্য ঠিক কি পরিমান অর্থ প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবে যে মোট প্রয়োজনীয় অর্থের ঠিক কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার দেবে আর কত অংশ রাজ্য সরকার দেবে।

কেন্দ্রীয় সরকার তার দেয় অংশের অর্থ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে অনুদান হিসাবে দেবে।

পিতা-মাতা/অভিভাবকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুকে প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য পাঠানো পিতা-মাতা/অভিভাবকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

বিদ্যালয় পরিচালনায় অভিভাবক, বিশেষ করে পিছিয়ে পরা এবং দুর্বলতর শ্রেণীর অভিভাবকরা, কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন?

একমাত্র বেসরকারি বিদ্যালয় ছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি (School Management Committee) তৈরী করতে হবে। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এলাকার কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্য, এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এই কমিটির সদস্য হবেন। পরিচালন কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ অর্ধেককে মহিলা হতে হবে। পরিচালন কমিটির অন্ততঃ ৭৫ শতাংশ সদস্য হবেন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। আবার অভিভাবকদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ পিছিয়েপরা এবং দুর্বলতর শ্রেণী থেকে আসবেন।

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Development Plan) তৈরী করবে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার ঐ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে।

এছাড়াও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজকর্মের তদারকি করবে এবং সরকারি বা বেসরকারি অনুদান বিদ্যালয়ে কিভাবে খরচ হচ্ছে তার তদারকিও করবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা কিভাবে নিয়োগ করা হবে?

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের নূ্যনতম যোগ্যতা কি হবে তা কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমিক অথরিটি (কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত) ঠিক করবেন।

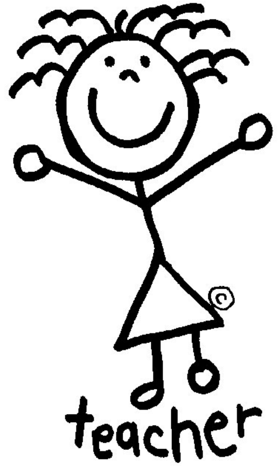

যদি কোনো রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকে বা নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক যথেষ্ট পরিমানে না পাওয়া যায় তবে ঐ যোগ্যতামান পাঁচ বছরের জন্য শিথিল করা যেতে পারে।

যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা অ্যাকাডেমিক অথরিটি নির্দিষ্ট নূ্যনতম যোগ্যতার কম থাকবে, এই আইন চালু হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ঐ নূ্যনতম যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম কি হবে এবং কিভাবেই বা ছাত্র-ছাত্রীরা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে?

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক অথরিটি বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে অ্যাকাডেমিক অথরিটি পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করবেনঃ

১) ভারতীয় সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে মিল বা সাযুজ্য।

২) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

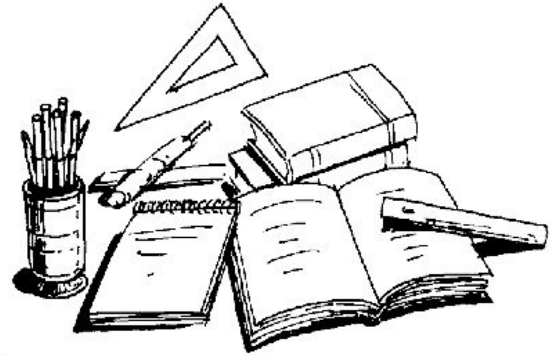

৩) শিশুদের মধ্যে জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভার বিকাশ।

৪) শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ।

৫) নতুন কিছু খোঁজ করা, আবিষ্কার করা এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শেখা। শেখার পরিবেশ হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শিশু-কেন্দ্রিক।

৬) শেখার ভাষা যতদূর সম্ভব শিশুর মাতৃভাষাই হবে।

৭) শিশুদের মন থেকে সমস্ত রকম ভয় এবং আশঙ্কা দূর করতে হবে। প্রত্যেক শিশু যাতে স্বাধীনভাবে তার কথা বলতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮) শিশু কতটা শিখতে পারছে বোঝার জন্য ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রতিটি শিশু বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর একটি শংসাপত্র (Certificate) পাবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মমত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন।

সময়মত নির্দিষ্ট পাঠক্রম পড়ানো শেষ করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীর শেখার ক্ষমতা বুঝে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া।

ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষায় উন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করা।

কোনো শিক্ষককে শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোনো কাজকর্মে নিয়োগ করা যাবেনা। তবে সরকারি জনগননা, নির্বাচনের কাজ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণের কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে।

কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না।

এই আইন অনুযায়ী বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি শিক্ষা না পেলে কার কাছে এবং কিভাবে অভিযোগ জানানো যাবে?

শিশুদের অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন এবং রাজ্য কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে। যদি এখনো রাজ্য কমিশন চালু না হয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার এইসব অভিযোগের তদন্তের জন্য জেলাতে এবং রাজ্যে আলাদা করে বিভাগ তৈরী করবে বা কর্তৃপক্ষ (Authority) নিয়োগ করবে।

এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখিতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হবে। এই মুহূর্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে পশ্চিমবঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে হবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে তিনমাসের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানাবে।

যদি কোনো ব্যাক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। যদি রাজ্যে শিশু সুরক্ষা কমিশন না থাকে তবে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে।

যেহেতু বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি শিক্ষা ৬–১৪ বছর বয়সি যেকোনো শিশুর মৌলিক অধিকার তাই এই আইনের প্রয়োগ না হলে বা অপপ্রয়োগ হলে হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টে সরাসরি জনস্বার্থ মামলা করা যাবে।

এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকতেই হবেঃ

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- ৬০ জন পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীর জন্য ২ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা,
- ৬১ থেকে ৯০ জন পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীর জন্য ৩ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা,
- ৯১ থেকে ১২০ জন পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীর জন্য ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা,
- ১২১ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীর জন্য ৫ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা,
- ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশী হলে ৫ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা ছাড়াও একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন,
- ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ২০০ জনের বেশী হলে প্রধান শিক্ষক ছাড়াও প্রতি ৪০ জন ছাত্র–ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা কি হবে?

- প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকতে হবে যাতে করে অঙ্ক–বিজ্ঞান, ভাষা এবং সমাজপাঠ (ইতিহাস–ভুগোল), প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকেন।
- প্রতি ৩৫ জন ছাত্র–ছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন।
- বিদ্যালয়ে ১০০ জনের বেশী ছাত্র–ছাত্রী থাকলে -
  - ◊ একজন পূর্ণ সময়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন,
  - ◊ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক থাকবেন,
    - ✻ শিল্পকলা শিক্ষা
    - ✻ স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা
    - ✻ কর্মশিক্ষা

এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকতেই হবেঃ

বিদ্যালয় ভবন (স্কুলবাড়ি) কেমন হবে?

* সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এমন পাকা বাড়ি।
* প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য অন্ততঃ একটি করে শ্রেণীককক্ষ।
* প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য একটি ঘর, এই ঘরটি অফিস এবং স্টোররুম হিসাবেও ব্যবহার করা হবে।
* বিদ্যালয়ে প্রবেশ বাধাহিন হবে যাতে করে শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধি ছাত্র-ছাত্রীরাও অনায়াসে বিদ্যালয়ে আসতে পারে।
* ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার।
* বিদ্যালয়ে সুরক্ষিত এবং যথেষ্ট পরিমান পানীয় জলের ব্যবস্থা সমস্ত শিশুর জন্য থাকতে হবে।
* প্রতিটি বিদ্যালয়ে "মিড-ডে মিল" রান্নার জন্য আলাদা রান্নাঘর থাকতে হবে।
* বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকতে হবে।
* বিদ্যালয় ভবন পাচিল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকতেই হবেঃ

বছরে অন্ততঃ কতদিন এবং কতঘন্টা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হবে?

* প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বছরে ২০০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
* ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য বছরে ২২০ দিন বিদ্যালয় চলবে।
* প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্ততঃ ৮০০ ঘন্টা পড়াশুনা হতে হবে।
* ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বছরে অন্ততঃ ১০০০ ঘন্টা পড়াশুনা হতে হবে।
* প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকা কে সপ্তাহে অন্ততঃ ৪৫ ঘন্টা বিদ্যালয়ে পড়াতে হবে।

প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে পাঠাগার (Library) থাকতে হবে যেখানে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, গল্পের বই এবং অন্যান্য বই থাকবে।

বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

এই আইনের অসুবিধা এবং অসম্পূর্ণতা

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল এবং সুপ্রীম কোর্ট ১৯৯৩ সালের একটি রায়ে (উন্নিকৃষ্ণন মামলা) বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ০-১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন। কিন্তু এই আইন সুপ্রীম কোর্ট এবং ভারতীয় সংবিধানের রায় এবং নির্দেশিকাকে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার কে বাতিল করেছে। একথা মনে রাখতে হবে যে ১৯৯৩ সাল থেকেই সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ০-১৪ বছর বয়সি শিশুদের মৌলিক অধিকার ছিল। ভারত সরকার সুপ্রীম কোর্টের এই রায়কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কোনোরকম পদক্ষেপ তো নেয়ই নি বরং ২০০২ সালের সংবিধান সংশোধন এবং সদ্য পাশ হওয়া আইনের বলে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারকে কেবলমাত্র ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য সীমাবদ্ধ রেখে দিয়ে ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। অন্যদিকে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই আইন ঐ শিশুদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার দরজাও প্রকারান্তরে বন্ধ করে দিয়েছে।

বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারকে প্রথম শ্রেণী আর অষ্টম শ্রেণীর সীমার মধ্যে রেখে এই আইন প্রাক-বিদ্যালয় (Pre-School) শিক্ষার গুরুত্বকে যেমন অস্বীকার করছে তেমনই অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষাকে গরীব মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে এই আইন গরীব মানুষের উচ্চশিক্ষায় বা কারিগরী শিক্ষায় যাওয়ার পথ কঠিন করে তুলেছে। কারণ যেকোনো ঐ ধরনের শিক্ষায় কমপক্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর যোগ্যতামান প্রয়োজনীয়।

এই আইনের অসুবিধা এবং অসম্পূর্ণতা

বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে আসা শিশুদের জন্য এই আইন বিভিন্ন মানের বিদ্যালয় শিক্ষার কথা বলে ভারতীয় সংবিধানের “আইনের সামনে সবাই সমান” এই বিধানকে হাস্যকর করে তোলে। এই আইন অনুযায়ী একমাত্র সরকার প্রতিষ্ঠীত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়েই যেকোনো শিশু বিনামূল্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পেতে পারবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব শিশুদের কাছে ঐ ধরনের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। অথচ টাকা খরচ করতে পারলেই যেকোনো শিশুর সামনে বেসরকারি বিদ্যালয়ের দরজা খুলে যাবে। অথবা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর শিশু হলেই সে নবোদয় বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা সৈনিক বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে যেখানে শিক্ষার মান সাধারণ সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় কয়েকগুন ভাল। অর্থাৎ এই আইন বলছে যে উন্নত বিদ্যালয় শিক্ষা সেই সব শিশুরাই পাবে যারা শিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করতে পারবে অথবা যারা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণী (যাদের বাবা-মা/অভিভাবক কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বা সামরিক বিভাগে আছেন, ইত্যাদি) থেকে আসবে। বাকি শিশুদের জন্য থাকবে নিম্নমানের সরকারি বিদ্যালয়ে আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা। এই ভাবে এই আইন “কোঠারী কমিশন” প্রস্তাবিত “কমন স্কুল সিস্টেম” -কে অগ্রাহ্য করে শিশুকালেই সামাজিক বৈষম্যের সুত্রপাত ঘটাচ্ছে।

বেসরকারি বিদ্যালয়ে পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বলতর শ্রেণীর শিশুরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাখরচে পড়তে পারবে এই নির্দেশ ঐ শিশুদের জন্য নতুন কোনো সুবিধা তৈরী না করে বরং বিড়ম্বনাই বাড়াবে। কারণ গরীব শিশুরা ঐ সব বিদ্যালয়ের সহপাঠি এবং পরিবেশের সঙ্গে কতদুর মানিয়ে নিতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এছাড়া অষ্টম শ্রেণীর পরে নিজের পড়ার খরচ নিজে বহন করতে না পারলে গরীব শিশুরা আবার রাস্তায় ফিরে যাবে যখন তাদের বড়লোক সহপাঠিরা পড়া চালিয়ে যাবে।

এই আইনের অসুবিধা এবং অসম্পূর্ণতা

বিনামূল্যে শিক্ষা (Free Education) এই শব্দটির কোনো পরিস্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে “কোনো শিশুর কাছ থেকে এমন কোনো অর্থ কেউ নিতে পারবেন না বা দাবী করতে পারবেন না যে অর্থ না দিতে পারলে ঐ শিশুর বুনিয়াদি-শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে”। এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। শিশুটি বিনামূল্যে তার বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য ঠিক কি কি পাবে, বই-খাতা, বিদ্যালয়ের পোষাক, মিড-ডে-মিল, বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়িভাড়া, এসব পরিস্কার করে বলা দরকার।

এই আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার দায়িত্ব কোন সরকারের কতটা আইনে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে এই আইন প্রয়োগের জন্য অর্থের সংস্থান করা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব। আর্থিক দায়ভারের কার কত অংশ এসব পরে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে। আমাদের আশঙ্কা আর্থিক দায়ভারের অংশভাগ নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবি যাতে কেবলমাত্র শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই আইনে গরীব পিতা-মাতার উপর তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা অমানবিক এবং এখানে সরকার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের অধিকাংশই শিশু শ্রমিক এবং তাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা সম্পূর্ণভাবে সরকারের দায়িত্ব। অথচ শিশুশ্রমিকদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে এই আইনে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

এই আইনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে যে নূন্যতম ব্যবস্থা থাকতেই হবে বলে বলা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীর জন্য একটি করে ঘর এবং একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায়নি। এই বিজ্ঞানের যুগেও বিদুৎ সংযোগ, কমপিউটার এবং টেলিফোন বিদ্যালয়ের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করা হয়নি। সরকার এখানে তার বহুচর্চিত কিন্তু ব্যর্থ বহুস্তরিয় শিক্ষানীতিকেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনুসরন করেছে।

তাই নাগরিক সমাজকে এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট হওয়ার সাথে সাথে এই আইনের অসুবিধা এবং অসম্পূর্ণতা সমন্ধে সরব হতে হবে এবং ০ থেকে ১৮ বছর বয়সি সমস্ত শিশুরে জন্য সমান গুনমান সম্পন্ন শিক্ষার মৌলিক অধিকারের আন্দোলন জারি রাখতে হবে।